Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.130-135
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও উদ্বাস্তু সমস্যা: বাংলা

শিশির কুমার হালদার
ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The partition of India was certainly the main cause of disunity as well as the refugee issue. Although we have come across various national partitions before and afterwards, yet the Partition of India introduces a diverse historical context. Turning the two communities against each other and lighting up the fiery grudge among the society and also giving it an institutional image, by converting a united land into two different nations, was a part of this partition It was a brutal attack on mutual companionship. Having arrived on the arks of British as the pioneer of anarchy, fulfilling their selfish desires behind the closed doors of sectarianism, tearing apart the soul of intact Indian, an era of temporary joy was introduced. The two nations India and Pakistan were brought in view in 1947. Even the constructors of this whole picture might not be able to realise the immense destruction it caused to the public lives and properties, or else maybe the lives, of the two shores would not have to get acquainted with so many riots, plunder, and rape, death and killing cases. Those who were once one soul in two bodies, the circumstances turned them into sworn enemies overnight. Even the Indian Army, Navy, Indian civil service, Rail and central Treasury and most importantly the unity among people were also divided. As a result, even if we are free from the British, the scars are still vivid. We still came across internal communal unrest and border issues. The flow of events is mentioned in this journal.

Keywords: India, Partition, British rule, Anarchy, Refugee, Communalism, Riot.

ভাগ বা বিচ্ছেদ শব্দটির সাথে পরিচিত আমরা সকলেই, কিন্তু এর সম্মুখীন আমরা কেউ হতে চাই না। কোন সুস্থ পারিবার হোক বা সমাজ, এই ভাগের পরিপন্থী জনমত নির্বিশেষে আমরা সকলেই। সেখান দেশভাগ কখনই মেনে নেওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ দেশ আমাদের কাছে কোন ভৌগলিক পরিমন্ডল নয়, তা আমাদের মাতৃসমা। তাই বার বার দেশমাতার শৃঙ্খলমোচনে অসংখ্য সন্তান জীবন দান করেছে, পিছপা হয়নি। আমাদের এই ভারতবর্ষ বহু বৈচিত্রের দেশ, বহু ভাষার দেশ, আসমুদ্র হিমাচল, মরু ও শস্য শ্যামল নদীমাতৃক এক দেশ। ভৌগলিক ভাবেই এর বিভিন্নতা সুস্পষ্ট, আর তাই বহু সংস্কৃতির রূপ চোখে পড়ে, এতো বিভিন্নতা এত বৈচিত্র সত্ত্বেও ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয় আমাদের মননে। কবি অতুল প্রসাদ সেনের ভাষায়–

"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

প্রকৃত অর্থে দেশ ভাগ যতটা না ছিল ধর্ম ও তার আদর্শের রূপরেখায়, তার চেয়ে বেশি ছিল কিছু মানুষের ক্ষমতা লোলুপ ও রাজনৈতিক স্বার্থান্বিত আশা-আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশের প্রতিচ্ছবি। দুই দেশের অগণিত জনগোষ্ঠীকে তার বাস্তুভিটে ছেড়ে আসতে বাধ্য করা হয়। তার পারিপার্শ্বিক ও ভৌগলিক আত্মকেন্দ্রের সাথে ছিন্নমূলে কুঠারাঘাত করে, নতুন এক পরিবেশে জীবন-জীবিকার উদ্দেশ্যে চলে আসতে। দেশভাগ দ্বিজাতিতত্ত্বের হিসেবে শুধু নয়, মানবতাবাদের বিভক্তের সমাবেশ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুরাটে বাণিজ্য স্থাপন ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ ঐতিহাসিক পালা বদলের ক্ষেত্র এবং ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ বক্সারের যুদ্ধ ও ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি লাভের সুবাদে তাদের ভিত মজবুত করে, সামাজিক বিভেদ সৃষ্টির পথ মসৃণ হলেও সাম্প্রদায়িক উস্কানি তখনও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। যা পেরেছিল ১৮৫৮ খিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় থেকে। ছোট ছোট সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। আর ইংরেজ সেই সুযোগে তাদের ছত্রভঙ্গ করার ফন্দি আঁটে। ইংরেজ শাসনে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যাই হোক তার মূলে ছিল সাম্প্রদায়িকতার বীজমন্ত্র। যা আজও স্থানীয় থেকে জাতীয় রাজনীতিতে সমান ভাবে প্রযোজ্য, আর তাতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের গোঁড়া ও মৌলবাদী সংগঠন ও তাদের নেতৃত্ব। এই একই ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর '১৯৪৬-৪৭' কবিতায়।

বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে সংস্কারের নামে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন আইন এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন কার্যকর করে, বিরাট সাংবিধানিক সংস্কার সাধনের নামে মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে ব্রিটিশ আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে বহু দিনের মনোবাঞ্ছা পূরণ করা হয়। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে, ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের সুপরিকল্পিত ভাবেই ১৯৪৭ খ্রিস্টিব্দে ব্রিটিশরা স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করেছিল বা স্বাধীনতা ভারতবাসীকে 'উপহার' দিয়েছিল। এই বিষয়ে হাওয়ার্ড ব্র্যাস্টেড ও কার্ল ব্রীজ-এর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকতার অবসান বিষয়ে যারা চর্চা করেন, তাদের এক প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয় যে ভারতবাসী কি স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, নাকি "ইতিবাচক বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের দায়িত্ব পালন হিসেবে" ইংরেজ স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। ব্রিটেন খুব ভালো করেই জানত ভারতবর্ষের শান্তিপূর্ণ শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য। ১৯৩৭ খ্রীঃ নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগ বিরাট সফলতা লাভ করে। বাংলাতেই ৩৬টি আসন ও সংরক্ষিত মোট ৪৮২টি আসনের মধ্যে ১০৪টি আসন লাভ করে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন। হকের ব্যাপক জনপ্রিয়তা বাংলাকে মুসলিম লীগের দুর্গে পরিণত করে। বাংলার নেতা হিসেবে ফজলুল হক লীগের সভায়, মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি রাখে । ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবে যার খসড়া রচিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রীঃ লীগের সফলতায় মহম্মদ আলী জিন্নাকে ভারতীয় মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে। এবছরই এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী দিল্লী কনভেনশনে 'একটি মুসলমান' রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যার ফলস্বরুপ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট সাক্ষ্য হয়ে আছে। এমতাবস্তায় ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের পেছনে এটলী অবলীলাক্রমেই স্বীকার করেছেন সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব।

১৯৪৬ খ্রীঃ জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকারে মুসলিম লীগ প্রথমে যোগ দেয়নি। অনেক আলোচনার পর লীগ সরকারে যোগদান করে। কিন্তু ততক্ষণে কলকাতা ও নোয়াখালি সহ অখন্ড ভারতের, অনেক জায়গায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমি রচিত হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটনের ভারতে পদার্পণ হয়। "মাউন্টব্যাটন ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এর মধ্যে আলোচনা হয়, আজাদ লর্ডকে

বোঝানোর চেষ্টা করেন যে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মত পার্থক্য কমে এসেছে।" "কিন্তু মাউন্টব্যাটন বলেন ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু ভারতবর্ষে চলমান হিন্দু-মুসলমান সংঘাত বন্ধের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। এমতাবস্থায় প্রশাসনের গা ছাড়া মনোভাবে দাঙ্গা দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।"

"মৌলানা আবুল কালাম ভারত বিভাগের ক্ষেত্রে দুটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ জওহরলাল নেহেরুকে রাজি করানোর বিষয় লর্ড মাউন্টব্যাটের স্ত্রীর একটি বড় প্রভাব, কারণ লেডি মাউন্টব্যাটেন তার স্বামীর কাজে যারা দ্বিমত করতেন, তাদের কাছে স্বামীর চিন্তাভাবনা পৌঁছে দিয়ে তাদের সম্মতি আদায় করতেন। অন্য কারণ ছিলেন কৃষ্ণমেনন। কৃষ্ণমেনন নেহেরুর একজন বড় ভক্ত ছিলেন, নেহেরুও কৃষ্ণমেননকে খুব পছন্দ করতেন।" সর্দার প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মৌলানা আজাদ তাঁর বইতে লিখেছেন "আমরা পছন্দ করি কিংবা না করি, ভারতবর্ষে দুটো জাতি আছে। হিন্দু এবং মুসলমানরা এক জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। যখন দুই ভাই একসাথে থাকতে পারে না, তখন তারা আলাদা হয়ে যায়। তাদের পাওনা নিয়ে আলাদা হয়ে যাবার পর তারা আবার বন্ধু হয়ে যায়। কিন্তু তাদের যদি একসাথে থাকতে বাধ্য করা হয় তাহলে তারা প্রতিদিন ঝগড়া করবে। প্রতিদিন মারামারি করার চেয়ে একবার বড় ঝগড়া করে আলাদা হয়ে যাওয়াটাই ভালো।"

"মাউন্টব্যাটেন অনেক আগেই কংগ্রেসের অন্দরে পাকিস্থান তৈরীর বীজ বপন করেছিলেন।" নেহেরুও আজাদকে অনুরোধ করেছিলেন ভারত ভাগ মেনে নেওয়ার কথা। মৌলানা আজাদ জওহরলাল নেহেরুকে সতর্ক করে বলেছিলেন- "আমরা যদি ভারত ভাগ করার বিষয়ে একমত হই তাহলে ইতিহাস কোনদিনও আমাদের ক্ষমা করবে না।" গান্ধীজী, নেহেরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে বোঝাতে ব্যর্থ হবার পর আজাদের উপরই শেষ ভরসা রেখেছিলেন। একদিন গান্ধীজী আজাদকে বলেছিলেন- "ভারত ভাগের বিষয়টি এখন বড় একটি ভয়ের কারণ হয়েছে। মনে হচ্ছে বল্লভভাই (সর্দার প্যাটেল) এবং জওহরলাল আত্মসমর্পণ করেছে। আপনি এখন কি করবেন? আপনি কি আমার পাশে থাকবেন নাকি আপনিও মত পরিবর্তন করেছেন? কংগ্রেস যদি ভারত ভাগের প্রস্তাব মেনে নেয় তাহলে সেটা আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হতে হবে। আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিন ভারতবর্ষ ভাগ মানব না।"

"জুন মাসেই ভারত ভাগ বাস্তব রূপ নেয়। ২০শে জুন বাংলা ও ২৩ শে জুন পাঞ্জাব অ্যাসেম্বলিতে দেশভাগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে যাবে এবং বাকিটা ভারতবর্ষে থাকবে। সিন্ধু, বালুচিস্তান ও পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আব্দুল গফফর খানের বিরুদ্ধে গিয়ে পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় মাউন্টব্যাটনের পরবর্তী কাজ ছিল দুটি সীমান্ত কমিশন নিয়োগ করা যার নেতৃত্ব দেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ। ছয় সপ্তাহের মধ্যে যে সীমানা নির্ধারণ হয়। তাতে ভাইসরয় মেনে নিলেও লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে তা ছিল নিপীড়নের সমান। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত পাকিস্তান স্বাধীন হয়। পাকিস্তানের করাচি নতুন রাজধানী স্থাপন হয় ও তার মসনদে বসেন জিন্না ও সেইদিনই মধ্যরাতে অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হিসেবে শপথ পাঠ করেন নেহেরু, যার পর তার ঐ বিখ্যাত 'ভাগ্যের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎ' নামক ভাষণ দেন।"

দেশভাগের যন্ত্রণার কাতরতায়, স্বাধীনতা সুখ এনে দেয়নি। অনেকেরই এই স্বাধীনতায় আনন্দের মানসিকতা ছিল না। "গান্ধীজীও সারাদিন কোন অনুষ্ঠানে যোগদান না করে উপোস ও প্রার্থনা করে কাটিয়ে দেন। ১৯৮৮ খ্রীঃ মৌলানা আবুল কালামের 'India Wins Freedom' গ্রন্থের (১৯৫৭) অপ্রকাশিত ত্রিশ পাতা প্রকাশিত হয়। মৌলানাও এই স্বাধীনতা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। বীর সাভারকরের মত জাতীয়তাবাদীরাও খুশি ছিলেন না, তারা চেয়েছিলেন এক অখণ্ড ভারতবর্ষ। আর. এস. এস. ও হিন্দু মহাসভার

মত রাষ্ট্রবাদী সংগঠন ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধানুষ্ঠানের প্রচার করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই নক্কারজনক রাজনীতির মুখোশ আলগা হয়ে সরে যায় ও চোখের ঠুলি খসে পড়ে যায়। কারণ স্বরূপ তাদের সামনে প্রকট হয়, উপমহাদেশের ইতিহাসে হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক অত্যাচার ও হত্যালীলা। যেখানে অত্যাচারের সংখ্যাটা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত ছিল। প্রায় এক মিলিয়ন ছিল নিহত মানুষের সংখ্যা ও ধর্ষিতাও হয়েছিল প্রায় ৭৫০০০ হাজার।"

দুই দেশের প্রান্ত থেকে ট্রেন ভর্তি মৃতদেহ আদানপ্রদান হতে থাকে। শরণার্থী শিবিরের দুরবস্থায় স্বাধীনতার আনন্দও তিক্ততায় ম্লান হয়ে যায়। ভারত ভাগজনিত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকারের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও পাকিস্থানে অনেক মুসলিমদের কাছে দেশভাগই ছিল আসল স্বাধীনতা। মানুষের মননের ইচ্ছা ও তার বহিঃপ্রকাশ এবং সামাজিক চালচিত্রের গতি প্রবাহ স্থান পায় ইতিহাসে। অগণিত মানুষের সাথে দেশ ছাড়তে হয়, দুই পারের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। এই ব্যথা আজও দগদগে হয়ে আছে। ভিটে-মাটি, জমি-জমা সব ছেড়ে রাতারাতি তারা হয়ে যায় উদ্বাস্তু। আর এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় ঐতিহাসিক দস্তাবেজ, সংবাদপত্র ও সাহিত্যিকদের লেখনির মাধ্যমে।

এক সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক হর্ষ দত্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেন, "নিজের দেশ, নিজের মাটি থেকে ছিন্নমূল হওয়ার ব্যথার ছোঁয়া রয়ে গেছে আপনার সৃষ্টিতে। কেন এ বিষয়টা ঘুরে ফিরে এসেছে?" সুনীল বাবু তখন উত্তর দেন, "দেশভাগ নিয়ে আমার বাবার একটি উক্তি আমার সবসময় মনে পড়ে।' ৪৭ এর ১৫ আগস্ট সকালে বাবা ভাঙা ভাঙা গলায় বলেছিলেন ভারত স্বাধীন হলো, আর আমরা দেশ হারালাম।" ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার পটভূমির উপর সাধারণ মানুষের স্বদেশ হারানোর ব্যথা অনুভূত হয়। বাঙালী হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে অত্যাচারের শিকার হতে হয় আপামর জনসাধারণকে। 'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসে উদ্বাস্তু হারীত মণ্ডল একসময় বলেন- 'সত্যিই আইশ্চর্য শহর। শিয়ালদহ ইষ্টিশনে রিফিউজি থিকথিক করত্যাছে তারই মধ্যদিয়া হৈ হৈ করতে করতে বনভোজন পার্টি যায়।' অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'স্বাক্ষর' গল্পে মজুর জহুরআলী ও দীননাথ সামিল হয় দাঙ্গায়। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, তাদের দুজকেই আশ্রয় নিতে হয় এক বাড়ির সিঁড়ির তলায়। সেখানে একজনের বিড়ি আর অন্যজনের দেশলাই তাদের মধ্যেকার দূরত্ব দূর করে দেয়, তারা বুঝতে পারে এই দেশ ভাগের পেছনে রয়েছে কিছু লোভী মানুষেরস্বার্থ। এই একই প্রতিচ্ছবি পাই সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পে সুতা মজুর ও নৌকার মাঝির ঘরে ফেরার গল্পে। এমনই রূপ ধরা পড়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সীমান্ত' ও 'ইজ্জত' গল্পে।

দেশভাগের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিফলন ঘটেছে পল্লি কবি জসীমউদ্দিনের বাস্তুত্যাগী কবিতায়-

"দেউলে দেউলে কাঁদিছে দেবতা পূজারীর খোঁজ করি
ফিরে এসো যারা গাঁ ছেড়ে গেছো, তরুলতিকার বাঁধে,
তোমাদের কতো অতীত দিনের মায়া ও মমতা কাঁদে।.....
অতীতে হয়তো কিছু ব্যাথা দেছি, পেয়ে বা কিছু ব্যাথা,
আজকের দিনে ভুলে যাও ভাই; সেসব অতীত কথা।"

দেশভাগ যেমন বাংলার বুক বিদীর্ণ করে, তেমনি পাঞ্জাবেরও চিত্র ছিল অনুরূপ ভয়াবহতা ও বিভৎসতায় পরিপূর্ণ। প্রবীণ পাঞ্জাবী সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার তাঁর আত্মজীবনী 'Beyond the line: An Autobiography' -তে প্রাণরক্ষাহেতু বিশাল জনতার বাস্তুত্যাগ ও নির্মম হত্যালীলার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে বারংবার। দুই বিপরীত মুখে একই দেশের নাগরিকের যাত্রা, যা কেউ কোন ভাবেই চায়নি। এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতির সূত্রপাত

বহু আগেই রচিত হয়েছিল, যার ফল আমরা দেখতে পাই, ১৯৪৬ এর আগষ্টে সংগঠিত, কলকাতা, নোয়াখালী ও ত্রিপুরার দাঙ্গায়, যা আমাদের মর্মে আঘাত হানে। ৪৭ শে এই প্রবাহধারায় নতুন করে গতি সঞ্চার করে। কিছু মানুষ আগেই পরিস্থিতির গভীরতা বুঝতে পেরে অর্থের বিনিময়ে দেশত্যাগ করেন। কিন্তু সাধারনের তা বুঝতে বা সামর্থে কোনভাবেই তা কুলোয়নি, ফলত তাদের সহায় সম্বলহীন ভাবেই পাড়ি দিতেই হয় স্বধর্মী, স্বদেশে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে, বিভক্তের কারন যেখানে ধর্ম।

৪৭ এর দেশভাগে সৃষ্ট উদ্বাস্তুদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসনের বিরূপ আচরণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে। 'ফন্টিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক কবি সমর সেন তাঁর 'বাবু বৃতান্ত' বইতে এই বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোকপাত করেছেন- "পূর্ব পাকিস্থান থেকে অনেক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এখানে এসেছেন। একসঙ্গে নয়, খেপে খেপে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য এমন কিছু করেন নি। যতটা করেছে উত্তর ভারতে।" "পাঞ্জাব, দিল্লী ইত্যাদি জায়গায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বীভৎস নরমেধ চলে, লক্ষ লক্ষ লোক অধিবাস ছেড়ে চলে আস্তে বাধ্য হন, নতুন জায়গায় গিয়ে যে সমস্যার মুখোমুখি হন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।" "যারা ক্ষমতা পেলেন তাদের কোন ক্ষতি হয়নি, তারা মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেয়েছেন।" "পূর্বপাকিস্থানে, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ভারতের মতো ভয়াবহ তান্ডব ঘটেনি। মাঝে মাঝে গণ্ডগোল বেঁধেছে। লোক মরেছে, আতঙ্কে অনেকে এখানে চলে এসেছেন। এখান থেকে কতজন পূর্ব পাকিস্থানে গিয়েছেন? এখানকার উদ্বাস্তুরা সবাই কলকাতায় বা আশেপাশে নেই, অনেককে বাইরে পাঠানো হয়েছে, যেমন দণ্ডকারণ্যে।" "উদ্বাস্তুদের আগমন পশ্চিমবঙ্গের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে সন্দেহ নেই।" "আসলে পশ্চিমবঙ্গের অনেকের মনোবৃত্তি উন্নাসিক, উদ্বাস্তুরা সরকারী বেসরকারীভাবে যথেষ্ট সহানুভূতি পাননি।"

ফরিদপুর থেকে নদীয়ায় আসা উদ্বাস্তু কবিয়াল সুরেন্দ্রনাথ সরকারের বাঁধা গানে এই ছবি প্রতিয়মান হয়-

"আমরা যারা বাস্তুহারা, একেবারেই সর্বহারা
তাদের অন্নচিন্তা চমৎকার।
তারা কেউ ঝোপে-জঙ্গলে, কেউ বা তাঁবুর তলে
কেহ প'ড়ে তালবেতালে, আছে আজ নৈতাতালে।
কেহ বা দুটো অন্নের জন্য রয়েছে দন্ডকারণ্যে,
কেহ বা বিনা খুনে গিয়েছে আন্দামানে".....

নির্যাতিত উদ্বাস্তুরা সাম্প্রদায়িক অসহযোগিতার বসবর্তী হয়ে লাঞ্ছনার স্বীকার হেতু স্বভূমি ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল, সেই ছটাক এখানেও চাক্ষুষ করে আতকে উঠতেন। উদ্বাস্তু নেতা হরিনারায়ণ অধিকারী লিখছেন- "রানাঘাটে এসে অনেকেই পাকিস্থানের পতাকা মাঝে মধ্যে উড়তে দেখে হতাশাগ্রস্ত হলেন। রানাঘাট, মাঝেরগ্রাম, বনগাঁ, প্রভৃতি রেল স্টেশনের নিকটবর্তী অনেক স্থনে সুযোগ পেলেই অনেক পাকিস্থান সমর্থকেরা পাকিস্থানের রাষ্টীয় পতাকা উড়িয়ে দিতেন।"

আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছে- "প্রান্তবর্তী রেললাইন ও লঙ্গরখানার মাঝে সেনাছাউনির পরিত্যক্ত জমিতে কিছু তাঁবু খাটিয়ে সূচনা ক্যাম্পের। আলো বলতে গোটা আঠারো পেট্রম্যাক্স আর হাজারটার মতো হ্যারিকেন। প্রত্যেক সাড়ে সাতশো মানুষের জন্য চল্লিশটি টিউবওয়েল। খাটা পায়খানা ও মুক্ত নর্দমা। লঙ্গরখানা থেকে দেওয়া হত ভাত, ডাল, আটা, জামাকাপড় আর ১ টাকা করে হাতখরচ বা 'ডোল'। প্রথমে মাত্র বাইশটি উদ্বাস্তু পরিবার নিয়ে শুরু হয় ক্যাম্প।" প্রথম দিকে বিহার ও উড়িষ্যা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিলে কিছুতা লাঘব হলেও, পরবর্তীকালে তারা উদ্বাস্তুদের আর নিতে অস্বীকার করলে, এই সংকট কালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায়

রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ কে মাঠে নামতে হয়। তিনি নদীয়ার ধুবুলিয়া ও রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে আসেন ও বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে তাদের আশস্ত করার চেষ্টা করেন। "১৯৫৪-৫৫ সাল নাগাত চালের অগ্নিমূল্য ও দুঃপ্রাপ্যতা উদ্বাস্তুদের বিপদগ্রস্ত করে তোলে। এই সময় চোরা কারবারীদের মাধ্যমে বর্ধমান থেকে বহরমপুর, দেবগ্রাম প্রভৃতি স্থানে কিছু চাল আসত যা রানাঘাটের চালের দামের তুলনায় কিছুটা সস্তা ছিল। রানাঘাটের দরিদ্র অনেক উদ্বাস্তু পরিবার এখান থেকে বহু দূরে ঐসব স্থানে মধ্য রাতের লালগোলা ট্রেন ধরে চাল কিনতে চলে যেত। সামান্য দু'চার আনা পয়সা বাঁচানোর চেস্টায় সারা রাত জেগে পরিবারের জন্য দু'চার কিলো চাল কিনতে এত দূরে যাওয়া-আসার ঘটনায় সে সময়ের উদ্বাস্তুদের করুণ আর্থিক পরিস্থিতির কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।"

এই কয়েক পাতায় দেশভাগ ও উদ্বাস্তু প্রসঙ্গর বর্ণনা তুলে ধরা সম্ভব নয়। কল্লোলিত রক্ত নদীর স্রোতে বাহিত হল কত শত নিস্পাপ জীবন, কে রাখে তার খোঁজ, কে নেয় তার খবর। হত্যামঞ্চের জীবননাট্যে ভাগ্যদেবী পরিহাষ করে গেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের দাগ তুলে ধরা যাবে না, এমন একটি ট্র্যাজিক ঘটনা যেখানে ছিন্নমূল মানুষের দীর্ঘ মিছিল, যার আলোড়ন সাহিত্যেও প্রকাশ পেয়েছে। স্থান পেয়েছে কাঁটা তারের ইতিহাসে। এক একটি পরিবারের কত তরুণ প্রাণ হারিয়ে গেছে কোন করুণ দৃশ্যপটে। তবে ইতিহাসে কতটা ধরে রাখা সম্ভবপর হয়েছে তা প্রশ্নাতীত, কোন দিন দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা শুধু ইতিহাসের একটি অধ্যায় বলে পরিচিত থাকলেও আজ কিন্তু এর বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, শিক্ষক ও গবেষকগণ তাদের অমূল্য সময় দিয়ে এই বিষয় গুলি তুলে আনার প্রয়াসে ব্রত।

তথ্যসূত্র:

১) সেন, অতুল প্রসাদ, গীতিগুঞ্জ।
২) গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ অভিজিৎ, দেশভাগ এর পটভূমি বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যে।
৩) মুন্না, দেবদুলাল, বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ, বিশেষ শিল্প সাহিত্য, বার্তা ২৪, বাংলাদেশ।
৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশান, কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০০৬।
৫) Brosted, H.V. and Bridge, Carl, The transfer of Power in South Asia: An History Graphical Review, South Asia, Vol. XVII, No.1 1994.
৬) হোসেন, আকবর, নেহেরু যে কারণে ভারত ভাগ করতে রাজী হলেন, ঢাকা, বাংলাদেশ, বিবিসি বাংলা, ৩০ আগস্ট ২০১৭।
৭) আনন্দবাজার পত্রিকা।
৮) ত্রিপাঠী, অমলেশ, 'বাংলার মুখ' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮।
৯) অধিকারী, হরিনারায়ণ, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী, কলকাতা, দি সেন্ট্রাল বুক এসেন্সি।
১০) বিশ্বাস, সুভাষ, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা প্রসঙ্গ নদীয়া জেলা, সোম পাবলিশিং, ডিসেম্বর, ২০১৬।